নেপালের নির্বাচনে কমিউনিস্টদের নিরঙ্কুশ বিজয়

বিজয় প্রসাদ

দীর্ঘকাল লড়াই সংগ্রাম এবং সংবিধান সভার কাজ শেষে গত ২০১৭ সালের ২৬ নভেম্বর ও ৭ ডিসেম্বর নেপালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট জোট নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে। এই নির্বাচনের তাৎক্ষণিক ছোট্ট একটি পর্যালোচনা লিখেছেন ভারতের প্রবাসী শিক্ষক ও লেখক বিজয় প্রসাদ। 'Communists Sweep the Nepali Elections, a Blow to the Establishment Parties'-শিরোনামে প্রকাশিত এই লেখার অনুবাদ করেছেন কল্লোল মোস্তফা। মূল লেখাটি পাওয়া যাবে এখানে: https://www. alternet.org/world/communists-take-nepal

মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় এখন বিশাল এক লাল পতাকা ওড়ার দৃশ্য কল্পনা করা যেতে পারে। নেপালের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল তো সে রকমই নির্দেশ করছে। দুটোতেই কমিউনিস্টরা নিরঙ্কুশ জয়লাভ করেছে। জাতীয় সংসদে কমিউনিস্ট জোট দুই-তৃতীয়াংশের মতো আসন পাচ্ছে। এরকম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে যে সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে তা যে শুধু পুরো পাঁচ বছর টিকে থাকবে তাই না, ২০১৫ সালের সংবিধানকে সংশোধনও করতে পারবে। ১৯৯০ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র গ্রহণ করার পর এবারই প্রথম নেপালে এরকম একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক– উভয় নির্বাচনের ফলাফল থেকেই দেখা যাচ্ছে, কমিউনিস্টরা গ্রাম থেকে শহর– সারা দেশেই জয়লাভ করেছে। নিজস্ব কর্মসূচি অনুযায়ী সরকার পরিচালনার জন্য শক্তিশালী রায় পেলেও সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী কে পি ওলি সতর্কতার সাথে বলেছেন, "অতীতে অনেক সময় দেখা গেছে, জয়লাভ করে দলগুলো উদ্ধত আচরণ করছে। রাষ্ট্র নিপীড়ক হয়ে উঠবে–এরকম একটা আশঙ্কাও রয়েছে। দেখা যায়, বিজয়ীরা নিজেদের দায়দায়িত্ব ভুলে বসে আছে।" কমিউনিস্ট সরকার এরকম কিছু করবে না বলে নিশ্চিত করেছেন ওলি।

২০০৮ সালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং ২০১৫ সালে সংবিধান সভা সংবিধানের একটি খসড়া তৈরি করে। সশস্ত্র যুদ্ধের অবসানের পর এক দশকে ১০ জন প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তিত হয়েছে এবং জনগণের জন্য সামাজিক উন্নয়নের কাজ হয়েছে খুবই সামান্য। এরকম একটা সময়েই প্রয়োজন ছিল দুর্নীতি ও নৈরাশ্য পেরিয়ে নতুন কিছু করার।

কমিউনিস্টরা কী করে এমন চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করল? ক্ষমতাসীন নেপালি কংগ্রেস দুর্নীতি-কেলেঙ্কারি ও অন্তঃকোন্দলে নিমজ্জিত, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন রূপকল্পও ছিল না তাদের। ২০১৫-১৬ সালে ভারত স্থলবেষ্টিত নেপালের সীমান্ত বন্ধ করে দিলে কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে কোন শক্ত ভূমিকা নিতে পারেনি। কমিউনিস্টরা কিন্তু চুপ থাকেনি, বিশেষ করে ওলির ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। জাতীয়তাবাদী আবেগ কংগ্রেস থেকে কমিউনিস্টদের দিকে প্রবাহিত হয়। শুধু তাই না, কংগ্রেস নির্বাচনের সময় জনগণের সামনে কোন সুসংহত জোট নিয়ে আসতে পারেনি। কংগ্রেসের জোট ছিল সংখ্যালঘু মাধেশি ও রাজতন্ত্রী পার্টির সমন্বয়ে জোড়াতালি দিয়ে গঠিত। এই অগোছালো জোটের পক্ষে কোনভাবেই জনগণকে আকৃষ্ট করা সম্ভব ছিল না।

অন্যদিকে কমিউনিস্টরা জনগণের কাছে গেছে খুব সাধারণ একটি স্লোগান নিয়ে– 'স্থিতিশীলতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি'। ১৯৯০ সালে রাজতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে নেপাল এক বিপর্যস্ত অবস্থা পার করছিল। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে কমিউনিস্টদের একটি অংশ দীর্ঘ এক দশকের সশস্ত্র লড়াইয়ের সূচনা করে, যা ১৯৯৬ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত চলে। এই যুদ্ধে প্রায় ১৭ হাজার মানুষ নিহত হন। সংবিধান সভার মাধ্যমে এক নতুন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটিয়ে এই যুদ্ধের অবসান হয়। ২০০৮ সালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং ২০১৫ সালে সংবিধান সভা সংবিধানের একটি খসড়া তৈরি করে। সশস্ত্র যুদ্ধের অবসানের পর এক দশকে ১০ জন প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তিত হয়েছে এবং জনগণের জন্য সামাজিক উন্নয়নের কাজ হয়েছে খুবই সামান্য। এরকম একটা সময়েই প্রয়োজন ছিল দুর্নীতি ও নৈরাশ্য পেরিয়ে নতুন কিছু করার।

নেপালের কমিউনিস্টদের দুটো প্রধান ধারা–মাওবাদী এবং নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (ইউনিফাইড মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট বা ইউএমএল) যৌথভাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং নির্বাচনের পরে একক দল গঠনের প্রতিজ্ঞা করে। দুই দল মিলে একক দল গঠনের এই ঘোষণাটি স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে দেয়। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করা কমিউনিস্টরা একসাথে মিলে কর্মসূচি নিতে সক্ষম। তারা যদি একতা বজায় রাখতে পারে তাহলে তারা সম্ভবত আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি স্থিতিশীল সরকার উপহার দিতে পারবে। তাদের প্রচারণার এটাই সম্ভবত সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ ছিল। ব্যালট বাক্সে এর প্রতিফলন দেখা যায়।

হিমালয়ের কমিউনিজম

১৯২০-এর দশকে চীন ও ভারতে কমিউনিজমের ছোঁয়া লাগলেও এ দুই দেশের ঘেরাওয়ের মধ্যে থাকা নেপাল ছিল তার বাইরে। রাজতন্ত্রের কঠোর দমন-পীড়নের কারণে দেশটিতে কোন প্রগতিশীল আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি। ১৯৪০-এর দশকের আগে নেপালে কমিউনিজমের কোন প্রভাব পড়েনি। ১৯৪৭ সালে বিরাটনগর পাট ও কাপড়ের কল শ্রমিকদের সাহসী এক ধর্মঘট মোহন অধিকারীর মতো কমিউনিস্টদের আকৃষ্ট করে। অধিকারী ছিলেন ভারতে নির্বাসিত। তিনি এবং ভারতের নেপালি শিক্ষার্থীরা আশঙ্কা করলেন, নেপালের অভিজাত রানারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে আঁতাত করে নেপালে সামরিক ঘাঁটি করতে রাজি হয়ে যাবে। এর ফলে নেপাল পশ্চিমা শক্তির খপ্পরে পড়বে এবং সার্বভৌমত্ব হারাবে। এই শিক্ষার্থী ও রাজনৈতিক কর্মীরা ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত। তাঁদের একজন পুষ্পলাল শ্রেষ্ঠ ১৯৪৯ সালে নেপালি ভাষায় কমিউনিস্ট ইশতেহার অনুবাদ করেন। ওই বছরেরই শেষের দিকে পুষ্পলাল শ্রেষ্ঠ, অধিকারী এবং অন্যরা মিলে নেপালের কমিউনিস্ট

পার্টি গঠন করেন।

প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকে কমিউনিস্ট পার্টি রাজতন্ত্রের অবসান এবং প্রজাতন্ত্র গঠনের ডাক দেয়। সেই সাথে সংবিধান সভা গঠনেরও আহ্বান জানায়। রাজতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে দলের ভেতরে তীব্র দ্বন্দ্বে দল বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৬৫ সালে চতুর্থ সম্মেলনের সময় সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নটি সামনে আসে। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নে বিভক্তি ২০০৬ সাল পর্যন্ত বজায় থাকে।

২০০৬ সালের পর থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম প্রাসঙ্গিকতা হারায়। সশস্ত্র সংগ্রামের কারণে দেশটিকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। যদিও বেশির ভাগ নেপালি বামপন্থী অস্ত্র হাতে তুলে নেননি। তাঁরা জনগণকে সাথে নিয়ে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদী সম্পত্তি সম্পর্কের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। গণতন্ত্রের জন্য জন-আন্দোলনের মধ্যে ১৯৯০ সালে গঠিত হয় ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট। এই দলটিকে বলা যেতে পারে ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (ইউনাইটেড মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট) দ্বারা প্রভাবিত, যা বর্তমান কমিউনিস্ট জোটের মূল ভরসা। তারা ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার সংগ্রামের মূল শক্তি। বর্তমান জোটের আরেকটি স্তম্ভ হলো মাওবাদীরা, যারা এখন সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছে। এ দুটি দল মিলেই নতুন বছরে গঠন করবে নতুন একটি দল, যা হতে যাচ্ছে নেপালের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি।

মাওবাদী নেতা পুষ্প কমল দহল (যিনি প্রচণ্ড নামেও পরিচিত) তাঁর নিজের এলাকা চিতওয়ানে বিজয় উদ্‌যাপনে এসে বলেছেন, "সরকার গঠন এবং দল একীভবন– দুটো প্রক্রিয়াই একসাথে চলবে।" মাওবাদীদের মধ্য থেকে প্রচণ্ড হবেন নতুন দলের নেতা এবং ইউএমএল থেকে ওলি হবেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৪৯ সালে গঠিত হওয়ার পর থেকে নেপালি কমিউনিজমের সমস্ত স্রোত এখন একত্রে মিলিত হবে।

কর্মসূচি

নতুন সরকারের কর্মসূচি কী হবে? কমিউনিস্ট সরকারের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী কে পি ওলি বলেছেন, তিনি সরকারের স্থিতিশীলতা রক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিতে চান। কিন্তু কেবল স্থিতিশীলতাই যথেষ্ট নয়। নেপালে দারিদ্র্য ও অবকাঠামোগত সমস্যা প্রকট। ওলি বলেছেন, তিনি নেপালের মৌলিক অবকাঠামোয় বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানাবেন, যার মধ্যে তিব্বত থেকে নেপালের মধ্যে চায়নিজ রেলপথ তৈরির প্রস্তাবও পড়ে। এর মানে নেপাল চীনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে–এরকম মনে করা ঠিক হবে না। খুব সম্ভবত সচেতনভাবে হিসাব করেই চীন ও ভারতের মতো দুই আঞ্চলিক পরাশক্তির ঠিক মাঝ বরাবর অবস্থান নেয়ার জন্য এই পদক্ষেপ। এই খেলার নাম বাস্তববাদিতা, চীনের প্রতি আদর্শিক আনুগত্য নয়।

রাজতন্ত্রী দলগুলোসহ নেপালের সমস্ত দলই চায় ২০২২ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বেরিয়ে আসতে। পার্থক্য কেবল লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ নিয়ে। কমিউনিস্টরা মাথাপিছু আয় বর্তমানের সামান্য ৮৬২ ডলার থেকে ৫ হাজার ডলারে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। আর এই মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ এবং তরুণদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি (বর্তমানে নেপালের ২ কোটি ৮০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ২০ লাখেরই কর্মসংস্থান দেশের বাইরে)।

এতসব কিছুর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সরকার কোথা থেকে জোগাড় করবে? দুর্নীতির অবসানের মাধ্যমে বিপুল অর্থ সাশ্রয় হবে। এছাড়া করের টাকার দক্ষ ব্যবহারও উন্নয়নের জন্য সহায়ক হবে। বামদের কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ফেডারেল রাজস্ব ব্যবস্থা। সম্পদের অর্ধেক প্রাদেশিক ও পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে বরাদ্দ দেয়া হবে। আশা করা হচ্ছে, এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আরও ভালোভাবে কাজে লাগবে। স্থিতিশীল সরকারের কারণে নেপালে পর্যটক ও অর্থ আসবে এবং সেই অর্থ জৈব কৃষি ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানির (যার মধ্যে জলবিদ্যুৎও রয়েছে) উন্নয়নে ব্যবহার করা যাবে। এর ফলে জ্বালানি আমদানির চাপ হ্রাস পাবে।

ওলি সকল রাজনৈতিক দলকে কমিউনিস্ট ঐক্যের সাথে হাত মিলিয়ে নেপালের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এটা কুশলী রাজনীতি। এর মাধ্যমে কমিউনিস্টদের কর্মসূচি জাতীয় কর্মসূচিতে পরিণত হবে। অধিপতি শ্রেণী ও জাতিগুলোর ওপর সামাজিক উন্নয়ন নীতিতে সম্মত হওয়ার চাপ তৈরি হবে। নেপালের জন্য তা হবে ছোট্ট একধাপ অগ্রগতি।

বিজয় প্রসাদ: লেফটওয়ার্ড বুকস-এর প্রধান সম্পাদক এবং ট্রাইকন্টিনেন্টাল: ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল রিসার্চ-এর পরিচালক। তিনি সব মিলিয়ে ২৫টি বই লিখেছেন, যার মধ্যে সাম্প্রতিকতম বইগুলো হলো–রেড স্টার ওভার দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড (লেফটওয়ার্ড, ২০১৭) এবং দ্য ডেথ অব দ্য নেশন অ্যান্ড দ্য ফিউচার অব দ্য অ্যারাব রেভলিউশন (ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ২০১৬)।

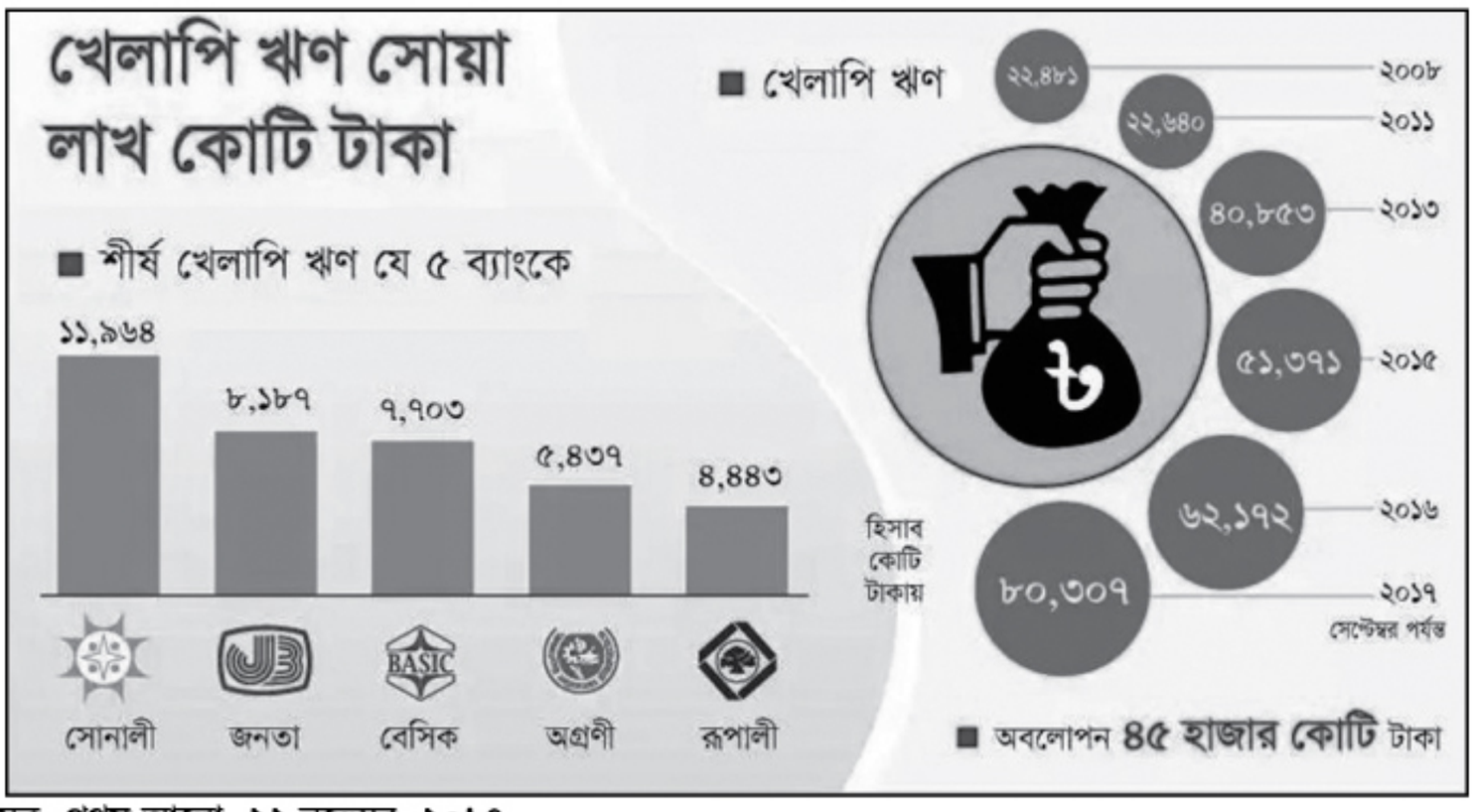

সূত্র: প্রথম আলো, ২২ নভেম্বর, ২০১৭